gali Rapid Reader for Class IV of all Bengali Medium Schools in West Bengal., U. P., M. P. & Delhi.

[ চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য ]

শ্রীপরমানন্দ রায়

প্রাক্তন শিক্ষক রামকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইস্টার্ন রেলওয়ে
A. T. P. School, আসানসোল বর্ধমান

স্টুডেন্টস্ বুক সাপ্লাই
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—৭০০০৭৩

মূল্য : ৫'০০ টাকা

প্রকাশক :
আশুতোষ দাস
স্টুডেন্টস বুক সাপ্লাই
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর :
এ. টি. দাস
রূপশ্রী প্রেস
১৮, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

দুষ্টের দমনের জন্য স্বয়ং ভগবানকেও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। কংসের হাত থেকে মানব সমাজকে বাঁচানোর জন্য নারায়ণকেও জন্ম নিতে হয়েছিল পৃথিবীতে। মথুরা নগরীর মহারাজা কংস। অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিলেন। নিজের বাবা উগ্রসেনকে বন্দী করে কংস রাজা হন। জ্যোতিষী তাঁকে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন কনিষ্ঠ বোনের সন্তানের হাতেই তাঁর মৃত্যু অবধারিত।

জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী শোনামাত্রই কংস তাঁর বোন দেবকী ও তাঁর স্বামী বসুদেবকে কারাগারে বন্দী করে রাখলেন। তাঁদের চোখের সামনে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে লাগলেন সন্তানদের জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে। সাতটি সন্তান বিনাশ করেও তাঁর মনে শান্তি ছিল না। জ্যোতিষীর কথামত অষ্টম সন্তানই হবে তাঁর হত্যাকারী।

আজ সেই লগ্ন উপস্থিত। মহারাজ কংস নিদ্রাহীন চোখে শয়নকক্ষে পায়চারি করছেন। মনে মনে ভাবছেন তাঁর এত

সম্পদ, এত ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, ত্রিভুবন যাঁর নামে কম্পিত—একটি অতি নগণ্য শিশুর জন্মাবার প্রতীক্ষায় আজ তাঁকে নিদ্রাহীন রজনী কাটাতে হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন। মনে মনে ভাবছেন নিয়তিকে তিনি ব্যর্থ করে দেবেন তাঁর নির্মমতার দ্বারা।

ভাদ্রমাসের অষ্টমী তিথি। রাত বারোটায় শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হবে। আকাশ অন্ধকারে ঢাকা। মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের তীব্র আলোয় পৃথিবী যেন চমকে উঠছে। সারা মথুরা নগরী তন্দ্রায় আচ্ছন্ন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কারাগারের গভীর অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠলো স্বর্গীয় আলো। দেবকী ও বসুদেবের মনে জেগে উঠলো আশার আলো। তাঁরা বুঝলেন এই শিশু সামান্য নয়—ঈশ্বরপ্রেরিত। এবার তাঁদের উদ্ধার হবে। ত্রাণ পাবে সারা পৃথিবীর লোক। শেষ হবে নির্মম অত্যাচারের—বিনাশ প্রাপ্ত হবে নিষ্ঠুর রাজা কংস।

আগে থেকে ঠিক করে রাখা একটা বেতের ঝুড়িতে ছেলেকে শুইয়ে দিলেন তাঁরা। বসুদেব শঙ্কিত মনে ঝুড়ি হাতে এগিয়ে যেতেই খুলে গেল কারাগারের বন্ধ কপাট। প্রহরীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

অবিশ্রান্ত ভাবে বৃষ্টি পড়ছে। বসুদেব অন্ধকার পথে চলেছেন যমুনার অপর পারে গোকুলের উদ্দেশে। যমুনা বর্ষার জলে থৈ থৈ করছে। কিন্তু তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যমুনার তীরে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে জল নেমে গেল। তিনি অনায়াসে হেঁটে এগিয়ে চললেন। গোকুলে পৌঁছে তিনি উপস্থিত হলেন তাঁর পরম বন্ধু নন্দর বাড়ী। বসুদেব বন্ধু-পত্নী যশোদার কোলে তুলে দিলেন নিজের পুত্রসন্তান। নন্দ আপন কন্যাসন্তানকে শুইয়ে দিলেন বেতের ঝুড়িতে।

নন্দর কন্যাকে নিয়ে বসুদেব মথুরায় পৌঁছতেই যমুনা আবার ভরে উঠলো অথৈ জলে। কারাগারের দরজা তখনও খোলা। প্রহরীরা ঘুমে অচেতন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য কেউ জানতে পারলো না।

বসুদেব দেবকীর কোলে কন্যাকে শুইয়ে দিতেই কেঁদে উঠলো সে। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলো প্রহরীরা। একদল ছুটলো রাজপ্রাসাদে কংসকে খবর দিতে দেবকীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

সন্তান জন্মাবার খবর শোনামাত্র উন্মুক্ত তরোয়াল হাতে খালি পায়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন কংস কারাগারের দিকে।

উগ্রমূর্তিতে কংস কারাগারে ঢুকেই ছিনিয়ে নিলেন দেবকীর কোল থেকে শিশুকন্যাটিকে। প্রচণ্ডবেগে ছুঁড়ে ফেলতে গেলেন একটি পাথরের উপর, কিন্তু কী আশ্চর্য !

হতবাক হয়ে কংস দেখলেন তাঁর হাত থেকে মেয়েটি ক্রমে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। অদৃশ্য হবার আগে সে কংসকে বলে গেল ঃ 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।'

এ কথা শুনে কংস ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ঘোষণা করলেন সমস্ত সদ্যোজাত শিশুকে হত্যা করা হোক। পুতনা রাক্ষসীকে তিনি গোকুলে পাঠালেন। সে নানা রূপ ধারণ করে শিশুদের হত্যা করতে লাগলো।

নন্দর বাড়ীতে ষষ্ঠীপুজোর উৎসবে সবাই ব্যস্ত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর ছ-দিনের দিন উৎসব চলেছে। পুতনা এক সুন্দরীর বেশে বাড়ীতে ঢুকে পড়লো। আদর করার ছলে বুকের দুধ খাওয়াতে গেল শ্রীকৃষ্ণকে। বুকে মেখেছিল তীব্র বিষ। কৃষ্ণ দুধে মুখ ঠেকাতেই বিকট চিৎকার করে রাক্ষসী প্রাণ হারালো। কংসের চেষ্টা বিফল হলো।

---

# মর্ত্যে গঙ্গা-অবতারণ

পুণ্যসলিলা গঙ্গা পৃথিবীকে ভরে দিয়েছে স্বর্গীয় সুষমায়। নিয়ত গঙ্গাস্নানে মনের গ্লানি মুছে যায়। অনাদিকাল থেকে কত মহর্ষি গঙ্গার তীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। তাঁরা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে সমগ্র জগৎকে শুনিয়েছেন ঈশ্বরের নির্দেশিত বাণী। আজও ভারতে সেই গঙ্গার পুণ্যধারা প্রবাহিত। হিমালয়ের পাদদেশে যেখান থেকে গঙ্গার জন্ম কত কত মুনি ঋষি আজও সেখানে সাধনায় মগ্ন হয়ে রয়েছেন।

এবার তোমরা শোন স্বর্গ থেকে কী ভাবে গঙ্গার ধারা পৃথিবীতে নেমে এলো।

সূর্যবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা সগর শতবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন স্থির করলেন। যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন তাঁর নামাঙ্কিত ফলক অশ্বের মাথায় লাগিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতো। অশ্বকে অনুসরণ করে চলতো তাঁর সেনাদল। যে অশ্বকে ধরতো তার সঙ্গে হতো যুদ্ধ।

সগর রাজার একে একে নিরানব্বইটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান শেষ হলো।

একশ বার পূর্ণ হতে মাত্র একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান বাকী। দেবরাজ ইন্দ্র বিচলিত হলেন। একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ একশত বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে সমর্থ হয়নি। এই যজ্ঞ করে তিনি আখ্যা পেয়েছিলেন 'শতক্রতু'!

মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে রাজা সগর যাতে দেবরাজের সমকক্ষ না হতে পারেন সেই জন্য তিনি এক অভিসন্ধি করলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র রাজা সগরের শততম অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বটি পাতালে লুকিয়ে রাখলেন। মহর্ষি কপিল ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ইন্দ্র গোপনে অশ্বটি বেঁধে চলে এলেন।

সগর রাজার রাজ্যে মহা হৈ চৈ শুরু হলো কার এতবড় দুঃসাহস অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করে। সগররাজের ষাট হাজার পুত্র পৌত্র সারা পৃথিবী তোলপাড় করে অশ্ব খুঁজে বেড়াতে লাগলো। অবশেষে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে তারা উপস্থিত হলো পাতালে কপিলদেবের আশ্রমে।

কপিলমুনিকে তারা চোর ভেবে মারবার জন্য উদ্যত হলো। অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি সগর সন্তানদের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজা সগরের ষাট হাজার পুত্র পৌত্র ভস্মীভূত হলো। এ ধরনের অপরাধ করবার জন্য পরলোকেও তাদের গতি হলো না।

সগরের ধীমান পৌত্র অংশুমান স্বগৃহে থাকায় বেঁচে রইলেন। কিন্তু তাঁর মনে শান্তি ছিলো না পরলোকগত পিতা-মাতামহ ও সগরবংশের সন্তানদের জন্য। তাঁদের পারলৌকিক সদ্‌গতির জন্য তিনি কপিলের সেবা ও তপস্যা করতে লাগলেন।

মহর্ষি কপিল খুশি হয়ে অংশুমানকে বর দিলেন ঃ "তোমার পৌত্র স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে এনে ভস্মীভূত পূর্বপুরুষদের দেহে স্পর্শ করালে তাদের পাপমোচন ও স্বর্গগতি হবে।"

রাজা অংশুমানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দিলীপ পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন।

রাজা সগর থেকে পঞ্চমপুত্র ভগীরথ। রাজা ভগীরথের একমাত্র চিন্তা, কি করে তিনি গঙ্গাকে মর্ত্যে এনে পূর্বপুরুষদের উদ্ধার সাধন করবেন। তিনি স্থির করলেন রাজপাট ছেড়ে তিনি গঙ্গার আরাধনা করবেন। রাজ্য ছেড়ে তিনি উপস্থিত হলেন হিমালয়ে। শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। দীর্ঘবৎসর সাধনায় দেহ হল শীর্ণ, অস্থিচর্ম সার! ভগীরথ আহার পরিত্যাগ করেছেন। এইভাবে হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করলেন!

অবশেষে গঙ্গার দয়া হলো। তিনি রাজি হলেন মর্ত্যে আসতে। কিন্তু তাঁর গতিবেগ ধারণ করবে কে? গঙ্গাদেবী ভগীরথকে বললেন, তুমি মহাদেবের আরাধনা করো। একমাত্র তিনি-ই আমাকে ধারণ করতে সমর্থ।

ভগীরথ আবার তপস্যা করতে শুরু করলেন। মহাদেব

তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গা-অবতরণের বেগ ধারণ করতে রাজি হলেন।

ভগীরথ তপস্যায় এবার কৃতকার্য হলেন। স্বর্গ থেকে প্রলয় বেগে গঙ্গা নেমে এলো পৃথিবীর বুকে। কিন্তু গঙ্গার অহঙ্কার নাশ করবার জন্য শিব তাঁর জটাজালে বন্দী করে
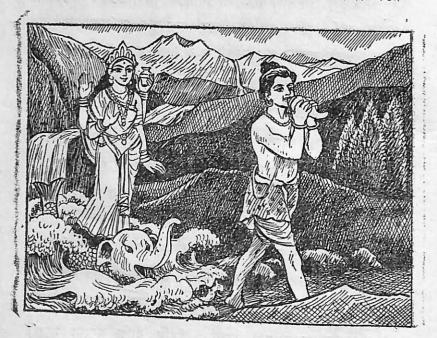
রাখলেন গঙ্গাকে। ভগীরথ শিবস্তুতি করে পুনরায় তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন। শিব একটি জটা ছিঁড়ে গঙ্গাকে বের হবার পথ করে দিলেন, গঙ্গা তিনটি ধারায় প্রবাহিত হলো। যে ধারা স্বর্গে বইতে লাগলো তার নাম মন্দাকিনী, যে ধারা পৃথিবীতে

নামলো তার নাম অলকানন্দা এবং যে ধারা পাতালে প্রবেশ করলো তার নাম ভোগবতী।

ভগীরথ শঙ্খধ্বনি করতে করতে এগিয়ে চললেন। তাঁকে অনুসরণ করে ধাবিত হলেন গঙ্গা।

গঙ্গা হিমালয়ে উপস্থিত হয়ে স্তব্ধ হলেন। পথ খুঁজে পেলেন না পৃথিবীতে নামবার। গঙ্গার উপদেশে ভগীরথ ইন্দ্রর বাহন ঐরাবতের স্তব করতে লাগলেন। ঐরাবত উপস্থিত হয়ে পর্বতের একপাশ ভেঙ্গে গঙ্গা অবতরণের পথ করে দিলো।

হিমালয় থেকে নামবার সময় জহ্নুমুনির আশ্রম প্লাবিত হলো। ক্রুদ্ধ হয়ে জহ্নুমুনি গঙ্গার সমস্ত জল পান করে ফেললেন। ভগীরথের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে জহ্নুমুনি নিজের ঊরু বিদীর্ণ করে গঙ্গাকে বের করে দিলেন। সেই থেকে গঙ্গার আর এক নাম হলো জাহ্নবী অর্থাৎ জহ্নুকন্যা।

গঙ্গা সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে প্রবাহিত হলেন পূর্বমুখে।

সবশেষে পুণ্য গঙ্গাধারা স্পর্শ করলো সগর সন্তানদের ভস্মরাশি। পাপমুক্ত হলেন সগর সন্তানগণ। স্বর্গারোহণ করলেন তাঁরা।

আদর্শ জননীর মহান শিক্ষায় গড়ে ওঠে সুসন্তানের জীবন। সেরূপ এক মহীয়সী মাতার কথা তোমাদের বলছি।

বীরত্বে পঞ্চপাণ্ডবের খ্যাতির অন্ত নেই। কিন্তু তাদের বীরত্বের পিছনে মহীয়সী মাতা কুন্তীর দান অনেকখানি।

ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য এই স্নেহময়ী জননী নিজে সন্তানকে শিক্ষা দিয়েছেন বিপদের মুখে রুখে দাঁড়াতে, মৃতুকে অগ্রাহ্য করতে। তাঁরই আশীর্বাদে তারা হাসিমুখে বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছে। মৃত্যুকে ভয় করতে তারা যে শেখেনি, তা মাতা কুন্তীর জন্যই।

দুর্যোধন একবার পঞ্চপুত্র সহ কুন্তীকে আগুনে পুড়িয়ে মারবার জন্য জতুগৃহ নির্মাণ করেছিল। এই অট্টালিকাটি এমন সব পদার্থ দিয়ে প্রস্তুত হয়েছিল যে একবার আগুনের ছোঁয়া লাগলে আর রক্ষা থাকবে না। যা হোক পাণ্ডবেরা পূর্বেই

দুর্যোধনের ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেছিল। তারা নিজেরাই জতুগৃহে আগুন দিয়ে গোপন সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করল। এদিকে ঘটনাক্রমে এক চণ্ডাল রমণী পাঁচ পুত্র সমেত সেই রাত্রে সেখানে

পাণ্ডবদের জতুগৃহ হতে পলায়ন

অতিথি হয়েছিল, তারা জতুগৃহের আগুনে পুড়ে মরল। দুর্যোধন ভুল সংবাদ পেল। সে জানল কুন্তীদেবী এবং তাঁর পাঁচ পুত্র জতুগৃহের আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছেন।

তখন রাজধানীতে ফিরলে দুর্যোধন আবার নূতন বিপদ ঘটাতে পারে এই আশঙ্কায় পাণ্ডবগণ স্থির করল তারা কিছুদিন

আত্মগোপন করে থাকবে। জতুগৃহ থেকে কোনক্রমে রক্ষা পেয়ে তারা নানাস্থানে ঘুরতে ঘুরতে একচক্রা নামক এক নগরে এসে উপস্থিত হল। সেই নগরে এক দয়ালু ব্রাহ্মণের গৃহে তাদের আশ্রয় মিলল। পাণ্ডবেরা ভিক্ষা করে যা পেত তার দ্বারা কোনরূপে সংসার চলত। এইভাবে কিছুকাল কেটে গিয়েছে। একদিন চার ভাই ভিক্ষায় বের হয়েছে, কেবল ভীম মাকে পাহারা দেবার জন্য বাড়ীতে রয়েছে। এমন সময় বাড়ীর ভেতরে কান্নার রোল উঠল।

ব্যাপার কি জানবার জন্য কুন্তী ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন ব্রাহ্মণের পরিবারের সকলেই কাঁদছে আর বলছে, "আমি যাবো, আমাকে তোমরা যেতে দাও!"

কুন্তী শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করলে ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "মা, সে বড় ভীষণ কথা! এই নগরের পাশের বনে বক নামে এক দুর্দান্ত রাক্ষস আছে। তার সঙ্গে দেশের রাজার চুক্তি হয়েছে যে রাক্ষস ইচ্ছামত নরহত্যা করবে না। নগরবাসীরা পালা করে প্রতিদিন একজন করে লোক পাঠাবে। আর সেই সঙ্গে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য। আজ আমাদের পালা এসেছে। রাক্ষসের বলি হতে কে যাবে তাই নিয়ে আমাদের এই কোলাহল।"

ব্রাহ্মণের কথা শেষ হতে না হতে আবার কান্নার ধূম পড়ে গেল। কুন্তী অনেক কষ্টে তাদের থামিয়ে বললেন, "আপনারা সকলে মিলে এভাবে শোক করলে আসল সমস্যার

কোন মীমাংসাই হবে না। তার চেয়ে শান্ত হোন, আমি যা বলি তাই শুনুন!"

সকলে শান্ত হলেন। কুন্তী পুনরায় বললেন, "রাক্ষসের কাছে আপনাদের কাকেও যেতে হবে না। আপনারা খাদ্যদ্রব্যের যোগাড় করুন। আমার মেজ ছেলে ভীম আজ বাড়ীতে আছে, সে-ই রাক্ষসের কাছে যাবে।"

ব্রাহ্মণ আকুল কণ্ঠে প্রতিবাদ করলেন, "সেকি কথা মা! আপনারা আমাদের অতিথি, আমাদের আশ্রিত। নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সাক্ষাৎ যমের মুখে আপনার ছেলেকে ঠেলে দেব? ছি ছি, সে যে মহাপাপ! তা কখনোই হতে পারে না।"

কুন্তী বললেন, "আমিও তো মা, নিজের ছেলের শক্তি না জেনেই কি তাকে যমের মুখে পাঠাচ্ছি? আপনাদের কোন ভয় নেই, ভীম নিরাপদেই ফিরে আসবে। তাছাড়া আজ যদি আপনার এতবড় বিপদের দিনে নিজের ছেলেকে লুকিয়ে রাখি, তাহলে তাকে চিরকাল লোকে কাপুরুষ বলবে। বীরপুত্রের জননী হয়ে আমি তা পারব না।"

কুন্তীর পীড়াপীড়িতে ব্রাহ্মণ শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। এদিকে মায়ের মুখে সব কথা শুনে ভীম আনন্দে লাফিয়ে উঠল। কতদিন পরে আজ একটা কাজের মত কাজ পাওয়া গিয়েছে! হস্তিনানগর ত্যাগ করবার পর থেকে বীরত্ব দেখাবার কোন সুযোগ আসে নি। নিষ্কর্মার মত ঘরে বসে আর দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে যেন হাড়ে ঘুন ধরবার জো হয়েছে।

ভীম যথাসময়ে ব্রাহ্মণ ও মাতা কুন্তীকে প্রণাম করে এক গোরুর গাড়ি ভরতি পিঠা পায়েস অন্ন ব্যঞ্জন নিয়ে বক রাক্ষসের উদ্দেশে যাত্রা করল।

নগর ছাড়িয়ে, লোকালয় ছাড়িয়ে ধীরে সুস্থে ভীম যখন বনের সীমানায় উপস্থিত হল তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। বক রাক্ষস ক্ষুধায় এবং রাগে ভীষণ মূর্তি ধারণ করে বনের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

ভীমের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই! এমনিতেই ভীম একটু পেটুক, তার উপর এক গাড়ি সুখাদ্য নিজের হাতে পাওয়া গিয়েছে। সে পরমানন্দে পিঠা খেতে খেতে বনের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে দিল। বক রাক্ষস দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখে ক্রোধে একেবারে অগ্নিমূর্তি! চক্ষের নিমিষে প্রকাণ্ড একটা গাছ উপড়িয়ে নিয়ে রাক্ষস ভীমকে আক্রমণ করল। কিন্তু ভীমের দেহে অসুরের মত শক্তি রাক্ষস তা জানত না। ভীম বাম হাতে গাছটি কেড়ে নিয়ে বহুদূরে ছুঁড়ে ফেলে আবার আহারে মন দিল। রাক্ষস পাগলের মত ভীমের পিঠে কিল চড় লাথি ঘুঁষি মারতে লাগল।

পায়েসের হাঁড়ি এক চুমুকে শেষ করে ক্রুদ্ধ ভীম উঠে দাঁড়াল। তখন দুজনে ভীষণ মল্লযুদ্ধ শুরু হল। বন কাঁপিয়ে, গাছ ভেঙে এমন দাপাদাপি আর গর্জন শুরু হল যে সে তল্লাটের পশুপক্ষী সব ভয়ে পালিয়ে গেল। ভীম একে বলবান, তার

উপঃ মায়ের আশীর্বাদে তার শক্তি দ্বিগুণ হয়েছে। বক রাক্ষস যত বড় রাক্ষসই হোক, শেষ পর্যন্ত সে ভীমের প্রহার সহ্য করতে পারল না। ভীষণ আর্তনাদ করতে করতে মরে গেল।

এদিকে সন্ধ্যা হয় হয়, কিন্তু ভীম আসছে না। মা কুন্তীর মন চিন্তায় আকুল। এক মুহূর্ত স্থির হতে পারছেন না। ঘর বার করছেন। ভিক্ষা শেষ করে যুধিষ্ঠির ও অন্য তিন ভাইও ঘরে ফিরেছে। তারাও ভীমের জন্য ব্যাকুল। রাক্ষসের হাতে নিশ্চয়ই ভীমের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর জন্য মাতা কুন্তীই দায়ী। ব্রাহ্মণ পরিবারও শোকে দুঃখে চুপ।

এমন সময় হাসিমুখে ভীম এসে মায়ের চরণে প্রণাম করল। গৃহে আনন্দ কোলাহল উঠল। বক রাক্ষসের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে একচক্রা নগরের সমস্ত লোক আনন্দে ছুটে এল। তারা ভীমকে অজস্র আশীর্বাদ করল। বীরপুত্র ও মাতার নামে জয়ধ্বনি উঠল।

যিনি সকলের চোখের সামনে মহৎ কাজ করেন তিনি মহৎ তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সকলের চোখের আড়ালে যিনি আপন মনে সৎকার্য করে চলেন তিনি কেবল মহৎ নহেন, তিনি সকলের আদর্শ চরিত্র।

রামায়ণে লক্ষ্মণের কথা অনেক আছে, ভরতের কথা অতি সামান্য। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠার কথা সকলেরই মুখে মুখে ফেরে। রামচন্দ্রের ছায়ার মত তিনি সর্বক্ষণ দাদার পিছনে পিছনে ফিরেছেন। বনে বনান্তরে চোদ্দ বছর কাটিয়েছেন। অনিদ্র, অনাহারী লক্ষ্মণের কথা রামায়ণে সোনার অক্ষরে লেখা আছে।

কিন্তু ভরত? ভরতের কথা ক'জনের মুখে শুনতে পাও? অথচ ভরতের তুল্য চরিত্র রামায়ণে আর নেই। জ্ঞানে, ন্যায়নিষ্ঠায়, সত্যপালনে, নির্ভীকতায়, ভ্রাতৃভক্তিতে ও ত্যাগে

ভরতের মত আদর্শ চরিত্র আর একটিও নেই। এই মহাত্মার নাম স্মরণ করলেও পুণ্য।

পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র বনে গিয়েছিলেন। সেই সময় ভরত অযোধ্যায় উপস্থিত ছিলেন না। থাকলে কি হত বলা যায় না। তিনি তখন মাতুলালয়ে। অযোধ্যায় যখন তিনি ফিরে এলেন তখন রামচন্দ্রের জন্য শোকে দুঃখে তাঁর পিতা রাজা দশরথের মৃত্যু হয়েছে। রামচন্দ্রকে বনে পাঠিয়ে নিজপুত্র ভরতকে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্র কৈকেয়ীর সফল হয়েছে। তাঁর পুত্র ভরতের রাজা হবার কোন বাধা আর নেই। সিংহাসন নিষ্কণ্টক।

ভরতকে অযোধ্যায় ফিরে আসতে দেখে রাজ্যের সকলেই মনে করেছিল ভরতের মাতার আয়োজন এইবার সার্থক হল। ভরত পরমানন্দে অযোধ্যার রাজা হয়ে বসবেন। কিন্তু বিপরীত ঘটনাই ঘটল। পর পর দুটি দুঃসংবাদ পেয়ে ভগ্নহৃদয়ে ভরত বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে জননী কৈকেয়ী যে কতবড় সর্বনাশ সাধন করেছেন তা বুঝতে পেরে ভরতের আর দুঃখের অবধি রইল না।

এদিকে বশিষ্ঠ প্রভৃতি কুলপুরোহিতগণ ও গুরুজনেরা তাঁকে অবিলম্বে রাজ্যভার গ্রহণ করতে বললেন। কারণ, রাজা ছাড়া রাজ্য অচল।

ভরত দৃঢ়স্বরে বললেন, "আপনারা গুরুজন, আমাকে অন্যায়

অনুরোধ করবেন না। রাজা দশরথের সিংহাসনে যদি কারো বসবার সত্যিকার অধিকার থেকে থাকে, তবে তা আছে আমার দাদা রামচন্দ্রের। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, অযোধ্যার সিংহাসনে আমি রামচন্দ্র ভিন্ন অপর কাউকে বসতে দেব না!"

ভরত কাজে এবং কথায় অটল। সকলে বিস্মিত ও আনন্দিত হল। এদিকে কৈকেয়ীও পুত্রের দৃষ্টান্ত দেখে নিজের হীন

কর্মের জন্য অনুতপ্তা। তিনি এতদিনে নিজের ভুল যেন বুঝতে পেরেছেন।

অবিলম্বে ভরত ছোটভাই শত্রুঘ্ন, রাজমাতাগণ ও অযোধ্যার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে চললেন। পথে শৃঙ্গবের রাজপুরীতে যেখানে রামচন্দ্র তৃণশয্যায় শয়ন করেছিলেন, ভরত সেই শয্যায় গড়াগড়ি দিয়ে বালকের মত উচ্চৈস্বরে কাঁদতে লাগলেন। গুহক চণ্ডাল প্রভৃতি রামের ভক্ত ও বন্ধুগণ ভরতকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন। এর পর ভরত ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। ভরদ্বাজ মুনি তো প্রথমে ভরতকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন, পরে তাঁর ধারণা বদলালো।

এইভাবে পথে নানা স্থানে নানা জনের সন্দেহ, অপবাদ, নিন্দা সহ্য করে ভরত অবশেষে চিত্রকূট পর্বতে উপস্থিত হলেন। এইখানে রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মিলন হল। ভরত দাদার পায়ে লুটিয়ে পড়ে চোখের জলে ভেসে বললেন, "আমি আপনার চরণে কি অপরাধ করেছি যে আমাকে এইভাবে গুরুদণ্ড দিয়ে আপনি বনে চলে এলেন?" রাম বিস্মিত হয়ে বললেন, "তোমাকে গুরুদণ্ড দিয়েছি? কি বলছ তুমি ভরত!" ভরত কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "এই রাজ্যভারই আমার পক্ষে গুরুদণ্ড, দাদা! এ ভার আমি কেমন করে বইব? আপনি ফিরে চলুন। আপনি রাজ্যভার গ্রহণ না করলে মাতা কৈকেয়ীকে অনন্ত নরক ভোগ করতে হবে।"

এইভাবে ভরত নানা যুক্তি দেখিয়ে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরে যেতে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। রামচন্দ্র জানালেন পিতৃসত্য পালন না করে তিনি ফিরতে পারেন না। ভরত বা কৈকেয়ীর কোন অপরাধ নেই। তিনি ভরতকে সস্নেহে অনুরোধ করলেন, ভরত যেন চোদ্দ বছর রামের অনুপস্থিতিতে রাজ্য পরিচালনা করেন।

ভরত প্রথমে কিছুতেই রাজী হলেন না। শেষে মুনি বশিষ্ঠ, বিমাতা কৌশল্যা প্রভৃতি গুরুজনের বারংবার অনুরোধে স্বীকৃত হলেন। শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা ভিক্ষা করে ভরত মাথায় করে নিয়ে আসলেন। মাতুলালয় নন্দীগ্রামে রাজধানী স্থাপন করে সিংহাসনে সেই পাদুকা রক্ষা করলেন। ভরত নিজে জটাবল্কল ধারণ করে ভোগবিলাস ত্যাগ করে রামচন্দ্রের সেবকরূপে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। সিংহাসন লাভ করেও ভরতের এই সন্ন্যাস জীবন অপূর্ব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত। তাঁর মহত্ব সকলের চোখের আড়ালে, নীরবে। তাঁর ত্যাগ ও নিষ্ঠার তুলনা হয় না।

কিন্তু এত করেও তিনি রামের ন্যায় মহাপুরুষের সন্দেহের অতীত হতে পারেননি। চোদ্দ বছর পর অযোধ্যায় ফিরে আসবার সময় ভরতকে পরীক্ষা করবার জন্য রামচন্দ্র তাঁর সেবক হনুমানকে বললেন, "যাও বৎস হনুমান, আমি রাজ্যভার

গ্রহণ করতে যাচ্ছি শুনে ভরতের মুখের অবস্থা কি রকম হয় একবার দেখে এসো।”

কিন্তু ভরতের পবিত্রতা সন্দেহের অতীত। জ্ঞানী হনুমান তা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই বলছি রামায়ণে মহৎ মহৎ চরিত্র অনেক আছে, কিন্তু আদর্শ চরিত্র বলতে সকলের আগে ভরতকেই মনে পড়ে।
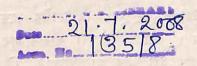
সমুদ্রে কিংবা মরুভূমিতে দিক নিরূপণ করবার সহজ উপায় সকলেই জানো। রাত্রিবেলা উত্তর আকাশের স্থির নক্ষত্রটি দেখে নাবিক বা পথিক পথ ঠিক করে। এই স্থির নক্ষত্রটির নাম ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারা হয়ত সকলেই দেখেছ, কিন্তু ধ্রুবকে কেউ দেখ নি। তার কথা হয়ত অনেকেই জানো না। সেই কাহিনীই তোমাদের এইবার বলব।

প্রাচীনকালে এই ভারতবর্ষে উত্তানপাদ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর দুই রাণী। বড় রাণী সুনীতি আর ছোটরাণীর নাম সুরুচি ; বড় রাণীর দিকে রাজার লক্ষ্য নেই। ছোটরাণীই রাজার আদরের মহিষী।

একদিন দুই রাণীর দুই ছেলে হল। একই সময়ে একই সঙ্গে। বড়রাণীর ছেলের নাম ধ্রুব, ছোটরাণীর ছেলের নাম উত্তম। বড়রাণী আর তাঁর ছেলে ছোটরাণীর চক্ষুশূল। ছোটরাণীর ভয়ে রাজাও তাঁদের আদর করেন না। ছোটরাণীর ঘৃণা আর রাজার অবহেলা রাণী সুনীতি এতদিন নীরবে সহ্য করে আসছিলেন। নিজের জন্য তাঁর দুঃখ নেই। কিন্তু ধ্রুবর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর বুক ফেটে যায়।

রাজকুমার হয়েও তার দীন দশা। কেউ ভাল মুখে কথা বলে না, আদর করে না। ছোটমায়ের ভয়ে ধ্রুব বাবার কাছে যেতে পারে না। কোলে বসতে পায় না। রাজা উত্তানপাদ যখন উত্তমকে কোলে বসিয়ে আদর করেন, তখন দূর থেকে তা দেখে ধ্রুব কেঁদে বুক ভাসায়। মা তাকে বুকে টেনে সান্ত্বনা দেন। এমনি করে পিতা থাকতেও পিতৃহারা শিশুর মত ধ্রুব বড় হতে থাকে।

একদিন ধ্রুবকে একা পেয়ে রাজা বললেন, "এস ধ্রুব, আমার কোলে বসো।" নিজের কানকে ধ্রুব যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার আনন্দ আর ধরে না, সে যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেল। কিন্তু ধ্রুব ছুটে গিয়ে যেই পিতার কোলে বসেছে অমনি কোথা থেকে ছোটমা সেখানে এসে উপস্থিত। বালক ধ্রুবর স্পর্ধা দেখে তিনি জ্বলে উঠলেন। রাজার কোল থেকে তাকে জোর করে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমার সাহস তো কম নয় দেখছি! রাজা হওয়ার সাধ হয়েছে বড়! তা সে আর এ জন্মে হচ্ছে না। বনে গিয়ে হরির নাম করে তপস্যা করগে যাও, পরের জন্মে যদি আমার ছেলে হয়ে জন্মাতে পারো।"

আজ ধ্রুবর মনে বড় আঘাত লাগল। এখন সে একটু বড় হয়েছে, একটু একটু বুঝতে শিখছে। কাঁদতে কাঁদতে ধ্রুব মায়ের কাছে গেল। এত কান্না বুঝি সে কোন দিন কাঁদে নি। ছেলের দুঃখে মাও মন খুলে কাঁদলেন। পরে বললেন, "তোমার ছোটমা ঠিকই বলেছেন, বাবা। মনে মনে ভগবান শ্রীহরিকে ডাক, তিনি ছাড়া আমাদের আর কোন বন্ধু নেই।"

ধ্রুব অবাক হয়ে বলল, "তাঁকে ডাকলে কি তিনি শুনতে পাবেন

আমার কথা? সুনীতি বললেন, "তিনি সব শুনতে পান, সব দেখতে পান, বাবা।"

ধ্রুব আবার বলল, "আমি যদি তাঁকে ডাকি তাহলে তোমার দুঃখও দূর করে দেবেন?" মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "একমনে তাঁকে ডাকলে সব পাওয়া যায় ধ্রুব। তাঁকে ডাকো, দেখবে ছোটমা তোমাকে ভালবাসবেন, তোমার বাবা আবার তোমাকে কোলে নেবেন, আদর করবেন।"

ধ্রুব মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে বলল, "তাহলে তুমি আর কেঁদোনা মা, হরিকে আমি ঠিক খুঁজে আনবো।"

ধ্রুবর নিজের জন্য বিশেষ দুঃখ আর ছিল না। মনের বেদনা

কেঁদে-কেটে জল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মায়ের দুঃখ সে ভুলতে পারছিল না। মায়ের চোখের জল সে সহ্য করতে পারে না। মায়ের দুঃখ দূর হবে জেনে সে মনে মনে আকুল হয়ে উঠল। যেমন করেই হোক হরির দেখা পেতেই হবে।

কাকেও কিছু না জানিয়ে ধ্রুব একা একা রাজপুরী থেকে

বের হল। লোকালয় ছাড়িয়ে ক্রমে এক বনের ধারে এসে পৌছল। এদিকে কখন যে দিনের আলো নিভে গিয়েছে সে খেয়াল করে নি। সম্মুখে হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ গভীর অরণ্য। বালক ধ্রুব একমনে হরিকে ডাকতে ডাকতে পথ চলছে। কোনদিকেই তার লক্ষ্য নেই।

হঠাৎ তার সমুখে পড়ল এক প্রকাণ্ড বাঘ। বালক ধ্রুব কখনও বাঘ দেখে নি, হরিকেও সে কখনও দেখে নি। বাঘ ডাকল, 'হালুম!'

ধ্রুব বাঘের গলা জড়িয়ে বলল, "হরি! তুমিই কি আমার হরি? আমার ডাক শুনতে পেয়ে এসেছ?"

বাঘ কথা বলতে পারে না, সে কোন উত্তর করল না। এই সরল শিশুর ব্যবহারে অবাক হয়ে বাঘটি বনের মধ্যে চলে গেল। এমনি করে বাঘ, সাপ, সিংহ, হাতী যাকেই সুমুখে পেল ধ্রুব তাকেই হরির কথা জিজ্ঞাসা করল। ধ্রুবর সরলতা দেখে সকলেই হিংসা, ভুলে গেল। কিন্তু হরি কোথায় থাকেন, কেউ তাকে বলে দিতে পারল না।

ধ্রুব বাড়ীর কথা ভুলে গিয়েছে। গভীর বনের মধ্যে একা একা তার প্রাণের ঠাকুরের নাম ধরে ডাকছে আর কাঁদছে। তার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, ঘুম নেই। ধ্রুবর অটল বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা দেখে বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির মন কেমন করে উঠল। তিনি তাঁর পরমভক্ত মহর্ষি নারদকে ধ্রুবর নিকট পাঠালেন। নারদ বনের মধ্যে এসে দেখলেন ধ্রুব একমনে শ্রীহরির আরাধনা করছে।

ধ্রুবকে তিনি বললেন, "এই ভীষণ বনের মধ্যে তুমি কি করছ ধ্রুব, তুমি এখনই ঘরে ফিরে যাও।"

ধ্রুব বলল, "আমি হরিকে ডাকছি।"

নারদ বললেন, "তুমি বালক, হরিকে পেয়ে কি করবে?"

ধ্রুব তখন তাদের দুঃখের কথা বলল। সে যে মায়ের দুঃখ দূর করবার জন্যই হরিকে ডাকছে তাও জানাল।

নারদ বললেন, "হরিকে পাওয়া বড় কঠিন কাজ। বড় বড়

মুনি-ঋষিরাই তাঁর দেখা পান না, তুমি তো ছেলেমানুষ। যাও দুঃখিনী মাকে কষ্ট না দিয়ে ঘরে ফিরে যাও। পরে বড় হয়ে আবার বনে এসো, কঠিন তপস্যা করো, হয়ত হরিকে পাবে। এখন যাও।"

ধ্রুব অটল। হরিকে না পেলে সে আর ফিরে যাবে না। তার ভক্তি দেখে নারদ মনে মনে খুশী হয়ে ধ্রুবকে ভগবান লাভ করবার উপায় শিখিয়ে দিলেন। নারদ বললেন, "ধ্রুব, এখান থেকে কিছুদূরে আছে মধুবন। সেখানে গিয়ে নদীর জলে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে হরিকে একমনে ডাকো। তাহলেই তাঁর দেখা পাবে।"

নারদ চলে গেলেন। ধ্রুব দুর্গম পথে মধুবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। পথে বহু কষ্ট সহ্য করে বালক ধ্রুব যেই মধুবনে পৌঁছল, অমনি মনে হল তার সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। নারদের কথামত নদীর জলে স্নান করে হরির ধ্যানে তন্ময় হয়ে রইল। ধীরে ধীরে শরীর শীর্ণ হল, ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধ চলে গেল, এমনকি দেহ আছে কি নেই সেই চেতনা পর্যন্ত লোপ পেল। তবু তার শীর্ণ দেহ ও কোটরগত চক্ষু দুটি থেকে এক অপূর্ব জ্যোতি বের হতে লাগল। ধ্রুবর তপস্যায় স্বর্গে দেবতারা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

বালক বয়সের এইরূপ কঠোর তপস্যা কেউ দেখেন নি। তাঁরা ধ্রুবকে নিবৃত্ত করবার জন্য নানারূপ ছলনা করে ভয় দেখাতে লাগলেন। কিন্তু ধ্রুব অটল। কোন ভয়-ভাবনা তার নেই। হরির চরণে দেহমন সঁপে দিয়ে সে বসে আছে।

হঠাৎ একদিন ধ্রুবর কানে সুমধুর বাঁশির সুর প্রবেশ করল। তার মন এতদিন পরে চঞ্চল হয়ে উঠল। কে যেন তার প্রাণের

ভেতর থেকে তাকে ডাকছে, "ধ্রুব, ধ্রুব, আমি এসেছি। তুমি কি চাও বলো ?"

ধ্রুব চোখ মেলল। তার চোখের সামনে এক দিব্যমূর্তি মৃদুমৃদু হাসছে। তার দেহমন যেন জুড়িয়ে গেল। তার প্রাণের ঠাকুর

তবে এতদিন পরে সত্যিই দেখা দিলেন! ধ্রুবর মনে হল ধন, দৌলত, মান, ঐশ্বর্য, সমস্তই অতি তুচ্ছ। ভগবানের নিকট এ সমস্ত কিছুই চাওয়া যায় না। জোড়হাত করে ধ্রুব বলল, "তবে এই আশীর্বাদ করো প্রভু, চিরদিন যেন তোমার চরণে আমার মতি থাকে। কোনদিন যেন তোমাকে ভুলে না যাই।"

"আর কিছু চাও ?" হরি বললেন।

"মনের মধ্যে যেন তোমাকে সর্বক্ষণ দেখতে পাই, ভগবান! এইটুকু আমার ভিক্ষা!"

"তাই হবে।" এই বলে শ্রীহরি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শ্রীহরির কৃপায় ধ্রুব ধন, মান, ঐশ্বর্য, ভালবাসা, সবই পেয়েছিল। ভগবানে অটল বিশ্বাস রাখার সবচেয়ে বড় পুরস্কার সে পেয়েছিল মৃত্যুর পরে। ধ্রুবলোকে তার অক্ষয় আসন মিলেছে। আজও দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষ সেই নক্ষত্র দেখে পথ ঠিক করে। অথচ একদিন ধ্রুবকে পথ বলে দেবার কেউ ছিল না।
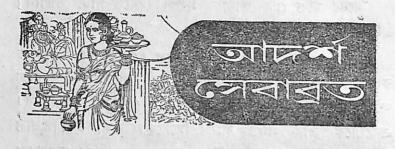
"যাঁরা বীর, যুদ্ধের সময়ে শত্রুর দেহে আঘাত হানাই তাঁদের ধর্ম। আর তুমি আমি যারা সেবাব্রত গ্রহণ করেছি, তাদের কাছে শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ জ্ঞান থাকা উচিত নয়। সেবাধর্মের কাছে আপন-পর ভেদ নেই।"

এই কথাগুলি কবে, কোথায়, কে বলেছিলেন তা জান কি? বীর অভিমন্যুর জননী, বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের মহিষী এবং মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে তাঁর সখী সুলোচনাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

সুভদ্রার কথাগুলি চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। আহত, পীড়িত ও ব্যথিতকে সেবা করার চেয়ে পুণ্য কাজ আর কিছু হতে পারে না। নিঃস্বার্থভাবে সেবা করা আর ঈশ্বরকে পূজা করা একই ব্যাপার। স্বামী বিবেকানন্দ তাই তো বলেছেন—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর!
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

মানুষের প্রতি ভালবাসা না থাকলে মানুষকে সেবা করা যায়

না। আর ভালবাসার কাছে তো শত্রু-মিত্র, আপন-পর, কিছুই নেই। সুভদ্রার কাছেও ছিল না। নারী মাত্রেরই ব্রত সেবা করা, সকলকে ভালবাসা—সেবাশুশ্রূষা করাই তার ধর্ম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে, বহু লোকক্ষয় হবে বুঝতে পেরে সুভদ্রার অন্তর বিগলিত হল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের অনুমতি নিয়ে এক বিরাট সেবিকাবাহিনী গঠন করলেন। যাদববংশের যে সমস্ত কন্যাগণ রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে সুভদ্রার সেবার জন্য নিযুক্ত ছিল, তাদের নিয়ে সুভদ্রা এই স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গড়ে তুললেন। অভিমন্যুর ধাই-মা এবং সুভদ্রার পুরানো সখী সুলোচনাকে এই সেবাদলের নেত্রী নিযুক্ত করলেন।

আজকাল হাসপাতালে বা আতুরালয়ে নানাপ্রকারের নার্স বা সেবিকা দেখতে পাও। যুদ্ধক্ষেত্রেও শুশ্রূষার জন্য আজকাল তাদের নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সেই বহু পুরাকালে সুভদ্রাই প্রথম এই সেবাব্রত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর নির্দেশ ছিল সেবিকাগণ কুরু-পাণ্ডব, বা শত্রু-মিত্র বিচার করবে না। আহত সৈন্যমাত্রকেই সেবা করবে। আবার কেবল তাই নয়, সুভদ্রার বিশেষ আদেশ ছিল শত্রু এবং মিত্র সৈন্যের মধ্যে সেবিকাগণ আগে শত্রুসেনার সেবা করবে, পরে স্বপক্ষীয়গণের দিকে মনোযোগ দেবে।

সুলোচনা সুভদ্রার এই আদর্শ প্রথমে বুঝতে না পেরে প্রতিবাদ করেছিলেন। আর সেই কারণেই সুভদ্রা ঐ কথাগুলি বলেছিলেন।

সুলোচনা দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন, "সখি! তোমার এই শত্রু ও মিত্রকে সমান চোখে দেখা, আমার ভালো লাগে না।

কুরুপক্ষীয় যোদ্ধাগণ পাপী। তাদের পাপের ভারে পৃথিবী ভারাক্রান্ত। পাপীদের বিনাশের জন্য এবং সাধুগণের উদ্ধারের জন্যই এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আয়োজন হয়েছে। তবে পাপীদের বাঁচাবার জন্যে তোমার এত আগ্রহ কেন ?"

এর উত্তরে সুভদ্রা বলেছিলেন,

"যেইজন পুণ্যবান কে না তারে বাসে ভালো,
তাহাতে মহত্ত্ব কিবা তার ;
পাপীরে যে ভালবাসে, আমি ভালোবাসি তারে,
সেইজন প্রেম অবতার।"

সুলোচনা কথাটি মন দিয়ে শুনলেন, কোন কথা কইলেন না। সুভদ্রা তখন আবার বললেন, "এ কেবল আমার কথা নয়, এ ভগবানের নিজের কথা, সখি !"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীর উপযুক্ত কথাই সুভদ্রা সেদিন বলেছিলেন। কিন্তু কেবল মুখে বলেই ক্ষান্ত হন নি, দিনের পর দিন সারারাত ধরে আহতদের সেবা করেছেন। দিনান্তে যখন যুদ্ধ বন্ধ হত, সকলে শিবিরে শিবিরে বিশ্রামের জন্য গমন করত, তখন সুভদ্রার সেবিকাবাহিনী বের হত। সোনার পাত্রে শীতল পানীয়, সোনার থালায় নানারকম সুখাদ্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের খুঁজে বেড়াত। সঙ্গে থাকতেন বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ। নানাপ্রকার ঔষধ, প্রলেপ, বন্ধনী বস্ত্রখণ্ড নিয়ে তাঁরা নেত্রী সুলোচনার নির্দেশ পালনে ব্যস্ত থাকতেন। আহত শত্রুসেনাগণকে নিজের শুশ্রূষা-শিবিরে এনে অতিশয় যত্নের সঙ্গে সেবা করা হত। তারা আরোগ্যলাভ করলে আবার তাদের স্বপক্ষীয় সেনাদলে নিরাপদে পৌঁছিয়ে দেওয়া হত। এই সেবিকাবাহিনীর দয়ায় প্রতিদিন বহু হতভাগ্য আহত সৈনিকের জীবনরক্ষা পেত। শত্রুপক্ষীয় আহত সেনাগণ পর্যন্ত সেবিকাবাহিনীর সেবাশুশ্রূষা পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত।

কি ভগবানের মনের রহস্য কে বুঝতে পারে! বিচিত্র তাঁর লীলা। কখনও তিনি ছলনা করেন, পরীক্ষা করেন, দুঃখ দেন। আবার কখনও এসে ভক্তের নিকট ধরা দেন। ভক্তের ভক্তির পরীক্ষা তিনি কঠিন হাতেই নিয়ে থাকেন। তাই চিরকাল সৎ মানুষ, ভক্ত মানুষের এত দুঃখ, এত শোক।

সুভদ্রাকে ভগবান কঠিনতম পরীক্ষা করলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র বীরবালক অভিমন্যুকে সেই শত্রুপক্ষীয় সেনাদলই অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করল। যাদের তিনি এতদিন সেবা করে এসেছেন, সেই মহাপাপী কৌরবগণ সুভদ্রার হৃদয়ে সর্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত দিল।

৩

কিন্তু সেবাব্রতী সুভদ্রা অকম্পিত চিত্তে তাঁর আদর্শকে আঁকড়ে থাকলেন। সেবাধর্মকে বিসর্জন দিলেন না। মনের শোক মনেই চেপে বীরপুত্রের বীরজননী শত্রুমিত্র বিচার না করে আহতকে সেবা করে চললেন। জগতে চিরকাল সুভদ্রার এই ধৈর্য, ক্ষমা এবং নিষ্ঠা পূজা পাবে। তিনিই আদর্শ সেবাব্রতা।

বিদ্যা ক্রয় করবার বস্তু নয়। অর্থমূল্য দিয়েও গুরুর ঋণ শোধ করা যায় না। গুরুর আদর্শই তাঁর শিষ্য বা ছাত্রের জীবনে সত্যিকার আলোক হয়ে পথ দেখায়। ভক্তি এবং নিষ্ঠা থাকলে ভক্ত এবং ভগবানের মতই শিষ্যের ব্যবধান ঘুচে যায়। পুরাকালে শিষ্যগণ গুরুকে কি পরিমাণ ভক্তি করত তার একটি গল্প শোনো।

দ্রোণাচার্যের নাম তোমরা শুনেছ। মহাভারতের যুগে তাঁর ন্যায় অস্ত্রবিদ্যায় পণ্ডিত আর কেউ ছিলেন না। কুরু এবং পাণ্ডুপুত্রগণের তিনি অস্ত্রগুরু ছিলেন। অর্জুন ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য। অপর শিষ্যদের তিনি যা শেখান নি সেইসব দুর্লভ অস্ত্র-কৌশলও তিনি অর্জুনকে গোপনে শেখাতেন। এইজন্য অর্জুনের মনে মনে একটু অহঙ্কার ছিল।

একদিন গুরুদেব তাঁর সমস্ত শিষ্যদের নিয়ে অরণ্যে শিকারে গিয়েছেন। রাজপুত্রগণ শিকারে এসেছে, তাই কত আয়োজন, কত ঘটা! শিকারী কুকুরের দল শিকারীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।

হঠাৎ সকলে অবাক হয়ে দেখল, তাদের একটি কুকুর গভীর বনের মধ্য থেকে ফিরে আসছে। সাতটি বাণে অদ্ভুত উপায়ে তার মুখ কেউ বন্ধ করে দিয়েছে। কুকুরটি আহত হয় নি বটে, কিন্তু

বিন্দুমাত্র শব্দও করতে পারছে না। তার স্বর বন্ধ। সকলেই স্তম্ভিত। এই বিদ্যা কারও জানা নেই। পৃথিবীতে কে এই আশ্চর্য ধনুর্বিদ, এই গভীর অরণ্যের মধ্যে যে আত্মগোপন করে আছে ?

দ্রোণাচার্য কুমারগণকে সঙ্গে করে সেই কুশলী ধনুর্বিদের সন্ধানে চললেন। বনের একাংশে এসে দেখলেন দ্রোণাচার্যের মূর্তির সম্মুখে

এক ব্যাধবালক একমনে অস্ত্র অভ্যাস করছে। সকলে বুঝল, এই ব্যাধবালক দ্রোণাচার্যকেই গুরুপদে বরণ করেছে। কুকুরটিকে শরাবদ্ধ করা এরই কাজ।

অর্জুন মর্মাহত হলেন। তাঁর মনে গুরুর পতি নিদারুণ অভিমান হল। গুরু দ্রোণাচার্য সকলের অগোচরে নিশ্চয়ই এই ব্যাধবালককে

অস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন। এদিকে গুরু দ্রোণাচার্য নিজেও অবাক। এই অপরিচিত ব্যাধবালক কি প্রকারে তাঁর শিষ্য হল! পুরাকালে অনার্যগণকে কোন আর্য অস্ত্রশিক্ষা দিতেন না। এই ব্যাধ অনার্য বালক।

দ্রোণাচার্য তার নিকট গিয়ে বললেন, "বালক, তুমি কে?"

বালক দ্রোণাচার্যকে চিনতে পেরে পদতলে লুটিয়ে প্রণাম করে বলল, "আচার্যদেব, আমি আপনার শিষ্য একলব্য!"

দ্রোণাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "মিথ্যা কথা! আমি ত তোমাকে কখনও শিষ্য করি নি। তুমি সত্য কথা বলো।"

একলব্য বলল, "প্রভু, আপনার কথা সত্য। কিন্তু আমার কথাও মিথ্যা নয়। আপনি আমাকে শিষ্য করেন নি সত্য, কিন্তু আমি আপনাকে মনে মনে গুরুপদে বরণ করেছি।"

দ্রোণাচার্য অবাক হয়ে বললেন, "তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না!"

একলব্য বিনীতভাবে বলল, "গুরুদেব, তবে শুনুন আমার কাহিনী। অনেকদিন আগে অস্ত্রশিক্ষা করবার জন্য আমি আপনার কাছে গিয়েছিলাম। ব্যাধের ছেলে বলে আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনার উজ্জ্বল মূর্তি আমার হৃদয়ে আঁকা হয়ে গিয়েছিল, আজও আছে। বনে ফিরে এসে আমি নিজহাতে মাটি দিয়ে গড়লাম আপনার মূর্তি। সেই মূর্তিকে পূজা করেই দিনের পর দিন আমি অস্ত্র অভ্যাস করছি। আপনার আশীর্বাদেই আজ আমি ধনুক ধরতে শিখেছি। তাই আপনি গুরু, আমি শিষ্য।"

সকলেই একলব্যের কাহিনী শুনে মুগ্ধ হল। এইরূপ নিষ্ঠা এবং ভক্তি কেউ ইতিপূর্বে দেখে নি। কিন্তু দ্রোণাচার্য অন্য কথা ভাবছিলেন। এই ব্যাধবালক এখনই অস্ত্রবিদ্যায় অর্জুনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। পরবর্তী কালে এই বালক পূর্ণসিদ্ধি লাভ করলে পৃথিবীতে সে অজেয় হবে তাতে সন্দেহ নেই। অথচ তিনি অর্জুনকে কথা দিয়েছিলেন যে তাকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ করে তুলবেন। এই
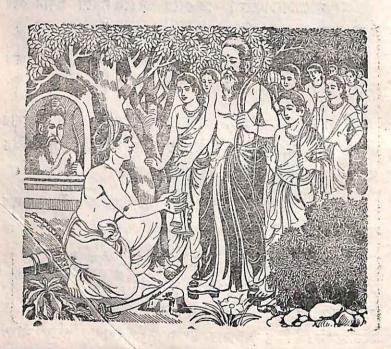
কথা চিন্তা করে দ্রোণাচার্য বললেন, "বৎস একলব্য, তোমার সাধনা সফল হয়েছে, আমিও খুশী হয়েছি! কিন্তু বিদ্যার্জনে নিয়ম আছে গুরুকে দক্ষিণা দিতে হয়। এখন তুমি যদি সত্যই আমার শিষ্য হও, তবে আমাকে গুরুদক্ষিণা দাও।"

একলব্য করজোড়ে বলল, "আমার বহুজন্মের ভাগ্য, প্রভু, আপনি আমার মত দীনহীন চণ্ডালের দান গ্রহণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু আমি দরিদ্র, আপনাকে কি দক্ষিণা দেব ভেবে পাচ্ছি না গুরুদেব!"

দ্রোণাচার্য বললেন, "তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি কেটে আমাকে দক্ষিণা দাও, আমি তাতেই সন্তুষ্ট হব।"

সকলে দ্রোণাচার্যের নিষ্ঠুর আদেশ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই দক্ষিণা গ্রহণের উদ্দেশ্য বুঝতে কারও বাকি থাকল না। একলব্যও একমুহূর্ত চুপ করে রইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই বাম হাতে তরবারি তুলে নিয়ে ডান হাতের বুড়া আঙুলটি কেটে গুরুর চরণে উপহার দিল। সকলেই বুঝল এই কাটা আঙুলটির সঙ্গে একলব্য তার সারাজীবনের সাধনাই বিসর্জন দিল। অস্ত্রচালনার ক্ষমতা আর তার রইল না।

এতবড় গুরুদক্ষিণা পৃথিবীতে বোধ হয় আর কেউ দেয় নি।

ইন্দুগণ জন্মজন্মান্তরে বিশ্বাসী। একই আত্মা বার বার দেহ ধারণ করে সংসারে আসে। এইভাবে জন্মলাভ করতে করতে পুণ্যকর্মের ফলে আত্মার অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, আর জন্ম হয় না। মায়া মমতা আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তি দ্বারাই আমরা সংসারে বাঁধা থাকি, সেই কারণেই ঘুরে ফিরে আমাদের জন্ম হয়। সাধারণ মানুষের কথা ছেড়েই দাও, একজন পরমযোগী পুরুষকেও এই মায়ামোহের ফলে পশুজন্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। সেই অদ্ভুত কাহিনীটি তোমাদের বলি শোনো।

অতি পুরাকালে আমাদের দেশে ভরত নামে এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং দাতা ছিলেন। সর্বদা ধর্মকর্মে ব্যাপৃত থাকতেন বলে সকলে তাঁকে রাজর্ষি বলত। রাজা হয়েও প্রকৃতপক্ষে তিনি ঋষিই ছিলেন।

এইভাবে রাজা ভরতের পঞ্চাশ বৎসর কেটে গেল। শাস্ত্রমতে এইবার তাঁর বনগমনের পালা এল। ভরত সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে বনে গমন করলেন। কিন্তু বিধাতার মনে বোধ হয় অন্যরূপ ইচ্ছা ছিল। তাই বনে এসেও ভরত সংসারের

মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারলেন না। ঘটনাটা এইরূপে ঘটল—

একদিন ভরত স্নান করে নদীতীরে জপে বসেছেন, এমন সময় এক হরিণী সেখানে জলপান করতে এল। কাছেই এক সিংহ
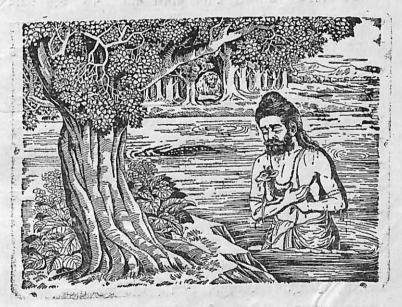
ছিল। সে হরিণীকে দেখে প্রচণ্ড গর্জন করে উঠল। হরিণী প্রাণভয়ে নদীর স্রোতে লাফিয়ে পড়ল। হরিণীর পেটে বাচ্চা ছিল। একটি শাবক প্রসব করে সে প্রাণত্যাগ করল। এই দৃশ্য দেখে দয়ালু ভরত ঈশ্বর-চিন্তা ত্যাগ করে হরিণ-শিশুটিকে রক্ষা করতে ছুটলেন।

নদীর স্রোতে ভাসমান হরিণশাবকটিকে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে তুলে আনলেন, কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে আর বনের মধ্যে তাকে ছেড়ে দিতে পারলেন না। তাঁর ভয় হল, কোন হিংস্র জন্তু

বাচ্চাটিকে হয়ত খেয়ে ফেলবে। তিনি নিজের কুটিরেই বাচ্চাটিকে প্রতিপালন করতে লাগলেন। ফলে ধীরে ধীরে এই অসহায় পশুটির মায়ায় জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর জপতপ সাধনভজন সব গেল। ভগবানের কথা ভুলে তিনি সব সময় মৃগশিশুর কথাই ভাবেন।

এত করেও পশু কিন্তু পোষ মানল না। বড় হয়ে হঠাৎ একদিন বনের মধ্যে উধাও হল। ভরত মনে ব্যথা পেলেন। মৃত্যুর সময়েও তিনি ঈশ্বরের চিন্তা না করে সেই মৃগশিশুর কথাই ভাবতে ভাবতে দেহত্যাগ করলেন।

এর ফলে পরজন্মে তিনি হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। তবে পূর্বজন্মে তিনি বহু পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন বলে জাতিস্মর হয়ে রইলেন। জাতিস্মর কাকে বলে জানো? যিনি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারেন তাঁকে জাতিস্মর বলে। সাধারণ মানুষের পক্ষে এ সম্ভব নয়, সিদ্ধপুরুষগণই নিজের পূর্বজন্মের কথা জানতে পারেন। মৃগরূপী ভরত ঠিক করলেন, এইজন্মে আর সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হবেন না।

মৃগরূপী ভরত মুনিঋষিদের আশ্রমের কাছে পড়ে থাকতেন। সেখানে যত পুণ্যময় বেদপুরাণ ইত্যাদি পাঠ হত একমনে তিনি তা শ্রবণ করতেন। এইভাবে তাঁর হরিণ-জন্ম শেষ হল।

এইবার ভরত ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করলেন। এই জন্মেও তিনি জাতিস্মর রইলেন। পূর্বজন্মগুলির কথা স্মরণ থাকায় এইবার ভরত খুব সাবধানে চলতে লাগলেন।

নিজেকে জড় পদার্থ মনে করে তিনি সংসারে বাস করতে লাগলেন। কারও সঙ্গে তাঁর যেন কোন সম্পর্ক নেই। তিনি জগতে একা। প্রয়োজন না হলে কিছু করেন না, কোন কথা বলেন

না। চুপচাপ আপন মনে পড়ে থাকেন। সকলে তাঁকে ঠাট্টা করে, কষ্ট দেয়। ভরত নীরবে সহ্য করেন।

কিন্তু এইভাবেও চিরকাল চলল না। পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁর উপর অত্যাচারের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল।

ভ্রাতাগণ তাঁকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করল। ভ্রাতৃবধূগণ তাঁকে দিনান্তে একবার অখাদ্য কুখাদ্য খেতে দিত। কিন্তু তাতেও ভরতের কোন বিকার নেই দেখে সকলে তাঁকে জড়ভরত বলত।
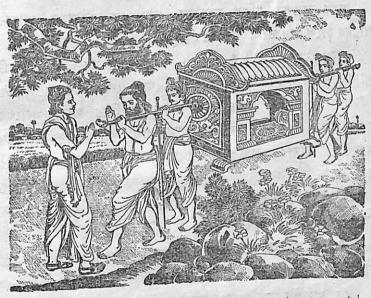
তিন জন্মের যোগসাধনার ফলে তাঁর মন ক্রমশ উচ্চ স্তরে উঠতে লাগল। সংসারের কোন দুঃখকষ্ট আর তাঁকে স্পর্শ করত না। তাঁর অন্তর সব সময়েই ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকত।

একদিন পথের পাশে এক বৃক্ষতলে বসে ভরত ঈশ্বর-চিন্তা করছিলেন। রাজা রহুগণ ঐ পথ দিয়ে সেই সময় পাল্কী করে

যাচ্ছিলেন। একজন পাল্কীবাহক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় রাজার লোকেরা জড়ভরতকে পাল্কীবাহক হিসাবে নিযুক্ত করল। ভরত কোন প্রতিবাদ করলেন না। কিন্তু পাল্কী-বহন তাঁর অভ্যাস নেই, তার উপর পায়ের তলাকার পিঁপড়ে, কীটপতঙ্গ বাঁচিয়ে এঁকে-বেঁকে চলেছেন। ফলে পাল্কী ভীষণ দুলতে দুলতে চলল।

রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে পাল্কী থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন, "ওহে মূর্খ ওভাবে চলছ কেন, মানুষের মত ঠিকভাবে হাঁটো!"

ভরত বললেন, "কিন্তু মহারাজ, পথে কত কীটপতঙ্গ, আমার পায়ের চাপে যদি তারা মারা যায়!"

রাজা রহুগণ ধার্মিক পুরুষ। তিনি বুঝলেন এই লোকটি সামান্য মানুষ নয়। তৎক্ষণাৎ পাল্কী থেকে নেমে ভরতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। ভরত আত্মপরিচয় না দিয়ে আবার আগের কথায় ফিরে গেলেন। বললেন, "মহারাজ, আপনি মূর্খ বললেন কাকে? আমার দেহকে? কিন্তু দেহ তো জড় পদার্থ, তার আবার বুদ্ধি-অবুদ্ধি কি! তবে কি আমার আত্মাকে মূর্খ বললেন? কিন্তু আত্মা তো এক, অভিন্ন! আপনার আত্মায় আমার আত্মায় কোন ভেদ নেই। তবে মূর্খ কে?"

রাজা রহুগণ ভরতকে মহাপুরুষ জ্ঞানে তাঁর চরণে পড়ে ক্ষমা চাইলেন এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

এর কতদিন পরে ভরত দেহত্যাগ করলেন। এর পরে তাঁকে আর জন্মগ্রহণ করতে হয় নি। এই মহাপুরুষের নাম থেকে আমাদের দেশের নাম হয়েছে ভারত।

---

# দানবীর হরিশ্চন্দ্র

রাজা হরিশ্চন্দ্র ছিলেন অযোধ্যার মহাপরাক্রমশীল রাজা। শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। কিন্তু শুধুমাত্র বীরত্বের জন্যই নয়, দাতা হিসাবেও তাঁর খ্যাতি পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল।

একদিন রাজা বিশ্বামিত্র মুনির তপোবনের পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি কয়েকটি বালিকার কাতর ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেলেন। আশ্রিতকে আশ্রয় দেওয়া, বিপন্নকে উদ্ধার করা রাজার ধর্ম। হরিশ্চন্দ্র রথ থেকে নেমে তাড়াতাড়ি তপোবনে প্রবেশ করলেন। মুনির আশ্রম তখন শূন্য, তপোবনে কেউ নেই। কেবল কয়েকটি বালিকা লতাজালে বন্দিনী অবস্থায় আকুল ক্রন্দন করছে দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ লতাজাল কেটে বালিকাদের মুক্ত করে দিয়ে রাজা চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মুনি বিশ্বামিত্র এসে তপোবনের লতাজাল ছিন্ন দেখে রাগে জ্বলে উঠলেন। তিনি তখনই ধ্যানে বসে সকল বিষয় জানতে পারলেন। মুনিবর হরিশ্চন্দ্রের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে বললেন, "রাজন্, তুমি আমার আশ্রমে প্রবেশ করে বিনা অনুমতিতে

কেন দেবকন্যাদের মুক্ত করে দিয়েছ? তারা কি অপরাধে ঐভাবে বন্দী ছিল, তা না জেনেই তাদের উদ্ধার করা তোমার মত ন্যায়পরায়ণ রাজার পক্ষে অনুচিত হয়েছে।"

রাজা হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, "প্রভু, আপনি শান্ত হ'ন। আমার অপরাধ নেবেন না, আমি কিছু না জেনেই বালিকাদের মুক্ত করেছি। তার কারণ, আমি পৃথিবীতে দুটি কাজকেই ধর্ম বলে জানি, বিপন্নকে উদ্ধার করা এবং অকাতরে দান করা।"
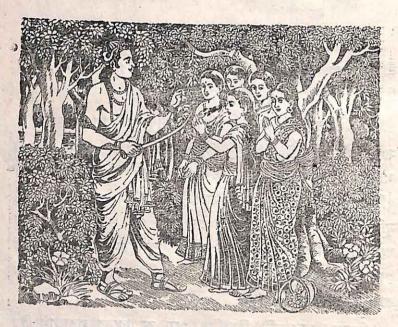
রাজা বন্দিনী বালিকাদের লতাজাল থেকে মুক্ত করছেন

বিশ্বামিত্র উত্তেজিত হয়ে বললেন, "প্রতিদিন ফুল লতাপাতা ছিঁড়ে, গাছ ভেঙে ঐ বালিকারা আমার আশ্রমের ক্ষতি করে, তপস্যার বিঘ্ন

ঘটায়। সেইজন্যে আমি ঐভাবে শাস্তি দিয়েছিলাম। তুমি ওদের মুক্তি দিয়ে অন্যায় করেছ।"

রাজা করজোড়ে বললেন, "প্রভু, আমি অধর্ম কিছু করি নি। দান এবং বিপন্নের উদ্ধার করাই আমার ধর্ম।"

বিশ্বামিত্র তখন রাজাকে বললেন, "বার বার তুমি তোমার দানধর্মের কথা বলছ। বুঝেছি, তোমার অহঙ্কার হয়েছে। বেশ, পারো তুমি আমাকে আমার ইচ্ছামত দানে তুষ্ট করতে?"

রাজা বললেন, "এ আমার অহঙ্কার নয়, প্রভু। আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই, আমি প্রতিজ্ঞা করছি।"

বিশ্বামিত্র হেসে বললেন, "খুব ভাল কথা। তুমি সমগ্র পৃথিবীর রাজা। পৃথিবী দান করে তুমি তোমার রাজধর্ম পালন কর।"

হাসিমুখে হরিশ্চন্দ্র বললেন, "তাই হবে গুরুদেব। আজ থেকে আপনি এই পৃথিবীর অধীশ্বর। আমি স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে রাজ্য ছেড়ে চলে যাবো।

হরিশ্চন্দ্র রাজসভা ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হলে মুনি বললেন, "রাজন্, দক্ষিণা ব্যতীত দান সিদ্ধ হয় না। তুমি ধার্মিক, দানের দক্ষিণা দিয়ে ধর্ম পালন কর।

রাজা তখন রাজকোষ থেকে সাতকোটি স্বুবর্ণমুদ্রা আনতে আদেশ করলেন। মুনি বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি আমাকে তোমার রাজত্ব দান করেছ। রাজকোষের অর্থে তোমার আর কোন অধিকার নেই। তুমি অন্য কোথা থেকে দক্ষিণার টাকা সংগ্রহ কর।"

রাজা হরিশ্চন্দ্র নিজের অবস্থা এইবার ঠিকমত বুঝতে পারলেন। অথচ দক্ষিণা না দিলে দান সিদ্ধ হবে না। অবশেষে মুনিবরের নিকট কিছু সময় প্রার্থনা করে তিনি রাণী শৈব্যা ও পুত্র রুহিদাসের

হাত ধরে কাশীধামে এসে উপস্থিত হলেন। কাশীধামকে তখন পৃথিবীর বাইরে ধরা হত। তাঁর সর্বক্ষণের চিন্তা, কি করে দক্ষিণার টাকা যোগাড় করা যায়।

রাণী শৈব্যা ও রাজকুমার রুহিদাসকে সেখানে এক ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রি করে চার কোটি স্বর্ণমুদ্রা লাভ করলেন। বাকি তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রার জন্য তিনি কাশীর এক চণ্ডালের কাছে নিজেকে বিক্রয় করলেন। এইভাবে সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রা বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা পাঠিয়ে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ও ধর্ম রক্ষা করলেন।

রাণী শৈব্যা ব্রাহ্মণের পরিচারিকা। কায়ক্লেশে তাঁর দিন চলে। বালক রুহিদাস ব্রাহ্মণের পূজার ফুল তুলে বেড়ায়। হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে তাদের আর দেখা হয় না। শৈব্যাও জানেন না, পৃথিবীর অধীশ্বর রাজা হরিশ্চন্দ্র আজ কাশীর শ্মশানঘাটে চণ্ডালের কাজ করছেন। এখন তিনি পাষাণের মত কঠিন। মায়া-মমতা শোক-দুঃখ তাঁকে কাতর করতে পারে না। এমনি ভাবে দিন যায়, দিন যায়, দিন যায়। হরিশ্চন্দ্রের মন থেকে বুঝি স্ত্রী-পুত্রের স্মৃতি মুছে গিয়েছে। শৈব্যা প্রতিদিন গোপনে চোখের জল মোছেন। রাজরাণী হয়ে আজ তিনি ক্রীতদাসী। কষ্টের সীমা-পরিসীমা নেই।

নিষ্ঠুর দেবতা কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হলেন না, শৈব্যার শেষ সম্বলটুকুও একদিন কেড়ে নিলেন। তাঁর নয়নের মণি রুহিদাস ফুল তুলতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা গেল। বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। স্বামী-শোকে জর্জরিতা শৈব্যা এই প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে পড়লেন। মায়ের বুকফাটা কান্নায় আকাশ বাতাস ভরে গেল। কিন্তু দাসীপুত্রের মৃত্যুতে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে এল না।

অগত্যা শৈব্যা একাকিনী মৃত পুত্র কোলে করে কাঁদতে

কাঁদতে শ্মশানে উপস্থিত হলেন। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাত্রি। তার উপর দুর্যোগের ঘনঘটা। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। নিকটে দূরে কোথাও জনমানব নেই।

স্ত্রীলোকের ক্রন্দন শুনে চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্র নিকটে এলেন। অন্ধকারে তিনি কারো চেহারা দেখতে পেলেন না। অভ্যাসমত কর্কশকণ্ঠে বললেন, "পাঁচ কাহন কড়ি দাও, তবে তোমার ছেলের সৎকার হবে।"

শৈব্যা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমি কেনা দাসী, এক

কানাকড়ি দেবার ক্ষমতাও আমার নেই। দয়া করে আমার বাছার সৎকারের ব্যবস্থা করে দাও। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।"

কিন্তু পূর্বের হরিশ্চন্দ্র আর নেই! তাঁর কঠিন হৃদয় অত সহজে আর গলে না। তিনি পাঁচ কাহন কড়ি না পেলে কিছুই করতে প্রস্তুত নন।

তখন নিরুপায় শৈব্যা উচ্চৈস্বরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "কোথায় আছো রাজা হরিশ্চন্দ্র, একবার শ্মশানে এসে তোমার স্ত্রী-পুত্রের দশা দেখে যাও। তোমার চোখের মণি রুহিদাসের আজ সৎকার করার সাধ্যও আমার নেই।"

কথা শুনে অন্ধকারের মধ্যেও চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্র চমকে উঠলেন। শৈব্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে, কে তুমি হতভাগিনী?"

এমন সময় আকাশ ঝলসিয়ে বিদ্যুৎ চমকাল। সেই আলোয় শৈব্যা ও হরিশ্চন্দ্র দুজন দুজনকে চিনলেন। স্বামী-স্ত্রী তখন মৃত পুত্র কোলে করে কাঁদতে লাগলেন। এইভাবে বহুক্ষণ কেটে গেল। রাত্রি গভীরতর হল। হরিশ্চন্দ্র শৈব্যাকে বললেন, "রুহিদাস ছাড়া আমাদের বাঁচার কোন অর্থ হয় না। এসো, রুহিদাসের চিতায় আমরা প্রাণ বিসর্জন দিই।"

রাজা অনেক যত্নে চিতা সাজালেন। চিতা জ্বলে উঠলে রাজারাণী দুজনে মৃত পুত্র কোলে করে সেই জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিতে উদ্যত হলেন। সহসা ধর্মরাজ যম এবং ঋষি বিশ্বামিত্র সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বাধা দিলেন।

বিশ্বামিত্র বললেন, "রাজা হরিশ্চন্দ্র! সত্যিই তুমি ধন্য। তোমার মত দাতা আমি আর দেখি নি। রাণী শৈব্যাও ধন্য। শত দুঃখেও তোমরা সত্যের পথ ত্যাগ করনি। তোমাদের কথা

চিরকাল মানুষ স্মরণ করবে। ধর্মরাজ মৃত রুহিদাসকে এখনই বাঁচিয়ে দেবেন।”

বিশ্বামিত্রের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রুহিদাস উঠে

বসল। তিনজনে ধর্মরাজ ও বিশ্বামিত্রের চরণে প্রণাম জানালেন। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন।

---

শিবি রাজ্যের রাজা উশীনর পরম ধার্মিক। তাঁর ন্যায় ন্যায়পরায়ণ রাজা সে সময়ে পৃথিবীতে আর ছিল না। তাঁর দানধ্যান যাগযজ্ঞের খ্যাতি স্বর্গে ইন্দ্রলোক পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

তাঁর রাজসভায় একদিন অতি অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল। পাত্রমিত্র সভাসদ নিয়ে রাজা উশীনর রাজসভায় বিচারে বসেছেন, এমন সময় একটি ভীত কপোত উড়ে এসে তাঁর কোলে আশ্রয় নিল। তখনকার দিনে পশুপাখিরা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারত। কপোতটি কাতরকণ্ঠে বলল, "মহারাজ আমাকে বাঁচান, ঐ নিষ্ঠুর বাজপাখি আমাকে হত্যা করতে আসছে।"

তার কথা শেষ হতে না হতেই একটি বাজপাখি উড়ে এসে রাজসভায় প্রবেশ করে বলল, "মহারাজ আমি ক্ষুধার্ত, কপোতটিকে ছেড়ে দিন, আমার খাদ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।"

উশীনর বললেন, "ক্ষুধিতকে অন্নদান রাজার ধর্ম। কিন্তু এই কপোত শরণাগত, একে রক্ষা করাই আমার প্রধান কর্তব্য। তবে তোমার আহারের জন্য আমি অন্য ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

বাজপাখি তাতে অসম্মতি জানিয়ে বলল, "ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস এভাবে কেড়ে নেবেন না মহারাজ! আমি ঐ কপোতের মাংসই ভোজন করব ঠিক করেছি। আমি অনেকদূর থেকে ওকে তাড়িয়ে এনেছি, আপনি ওকে ছেড়ে দিন।"

রাজা উশীনর বললেন, "সে হয় না। আশ্রিতকে ত্যাগ করলে আমাকে অনন্ত নরক ভোগ করতে হবে। সে মহাপাপ আমি করতে পারব না।"

বাজপাখি বলল, "কিন্তু এটাও তো পুণ্যকাজ হচ্ছে না, মহারাজ! ক্ষুধার জ্বালায় আমি অস্থির হয়েছি। খাদ্যাভাবে আমার মৃত্যু হ'লে কি আপনার পুণ্য হবে? তাছাড়া আমার মৃত্যু হ'লে, আমার শোকে আমার স্ত্রী পুত্র কন্যারাও হয়ত বাঁচবে না, তখন আপনার রাজধর্ম কি রক্ষা পাবে?"

উশীনর বললেন, "পাখি হ'লেও, তোমার কথার পেছনে যুক্তি আছে তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমাকে বিপদে ফেলে তোমার কি লাভ? তুমি জানো, আমি শত বাধা পেলেও শরণাগতকে ত্যাগ করতে পারব না। তার চেয়ে, কপোতের সমপরিমাণ যে-কোন মাংস নিয়ে তুমি ফিরে যাও।"

বাজপাখি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "যে-কোন মাংস দিতে আপনি রাজী? কপোতের সমপরিমাণ মাংস আমি যে-কোনো জায়গা থেকে নিতে পারি?"

উশীনর বললেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যখন, নিশ্চয়ই দেব।"

বাজপাখি বলল, "তাহলে মহারাজ, আপনার শরীর থেকে ঐ পরিমাণ মাংস কেটে আমাকে দিন। আমি বড় ক্ষুধার্ত।"

বাজপাখির নিষ্ঠুর আকাঙ্ক্ষা শুনে সভাসদ সকলে ব্যথিত ও চমকিত হলেন। রাজা কিন্তু একটুও বিচলিত হলেন না। বরং আশ্রিত কপোতকে রক্ষা করবার সহজ উপায় হওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, "হে পক্ষিকুলশ্রেষ্ঠ, তোমার প্রার্থনা আমি এখনই পূরণ করব।"

রাজা উশীনরের আদেশে তৎক্ষণাৎ তুলাদণ্ড ও শাণিত অস্ত্র এল। দাঁড়িপাল্লার একদিকে কপোতটিকে বসিয়ে নিজের হাতেই শরীরের মাংস কেটে অপর দিকে তুলে দিতে লাগলেন। সভাসদগণ সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চোখ বুজল। কিন্তু এদিকে উশীনর মহা সমস্যায় পড়লেন। যতই শরীরের মাংস কেটে পাল্লার উপর রাখেন, ওই ছোট কপোতটির ওজন ততই ভারী হয়।

রাজা বুঝলেন, কোন দেবতা শ্যেন ও কপোতের রূপ ধরে তাঁকে ছলনা করতে এসেছেন। কিন্তু একবার মুখে যা

উচ্চারণ করেছেন, তা তাঁকে করতেই হবে। না হলে ধর্ম রক্ষা হয় না।

অবিরাম রক্ত ক্ষরণের ফলে ও যন্ত্রণায় রাজা যেন জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। যেমন করেই হোক প্রতিজ্ঞা তাঁকে রক্ষা করতেই হবে। কোন উপায় না দেখে অবশেষে তিনি দাঁড়িপাল্লার উপর উঠে বসলেন। সভার সকলে হাহাকার করে উঠল।

রাজা করজোড়ে বললেন, "হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ, অবিরত রক্তপাতে আমার দেহ অবসন্ন। আমি আর পারছি না। তুমি কে, জানি না। দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, যেই হও, আমার এই দেহ তোমাকে দিলাম, এই দেহের মাংসে তৃপ্ত হয়ে তুমি আমার আশ্রিতকে রক্ষা কর।"

তখন শ্যেন এবং কপোত ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন। শ্যেনপাখি ইন্দ্রের এবং কপোত অগ্নির মূর্তি ধারণ করলেন। সকলে দেবতাদের আবির্ভাবে স্তম্ভিত হল। পরম তুষ্ট হয়ে ইন্দ্র ও অগ্নি উশীনরকে জানালেন যে, তাঁরা ধর্ম পরীক্ষা করবার জন্যই মায়ারূপ ধরে সভায় এসেছিলেন। ধার্মিক রাজা ধর্মের পরীক্ষায় জয়ী হয়েছেন। এমন সময় স্বর্গ থেকে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। ধর্মরাজ যম নিজে স্বর্গ থেকে রথ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। উশীনরের ক্ষত-বিক্ষত দেহে তিনি হাত বুলিয়ে দিতেই রাজা আবার পূর্বের দেহ ফিরে পেলেন।

এরপর রাজা উশীনর ইন্দ্র, অগ্নি ও যমরাজের সঙ্গে সেই স্বর্গীয় রথে চড়ে সশরীরে স্বর্গে গেলেন। মহাপুণ্যবান ছাড়া কেউ দেহ নিয়ে স্বর্গে যেতে পারে না। উশীনরের মত ধার্মিক পুণ্যবান রাজার কথা মানুষ আজও ভুলতে পারে নি। কোন দিন পারবেও না।

# সুদামার সখ্য

অভাবে অথবা ঐশ্বর্যে যিনি সমভাবে বন্ধুকে মনে রাখেন, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। একটি অমর বন্ধুত্বের কাহিনী তোমাদের বলি শোনো।

শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকার রাজা। অসীম তাঁর ক্ষমতা, অতুল তাঁর ঐশ্বর্য। রাজা তো পৃথিবীতে কত ছিলেন, কত আছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মত রাজা একজনও নেই। কারণ তিনি আসলে নরদেহধারী ভগবান। তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে সমস্ত পৃথিবীবাসী চমকিত। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তাঁর জুড়ি নেই।

বাল্যকালে বৃন্দাবনে কত খেলা তিনি খেলেছেন, কত বন্ধু তাঁর ছিল! আজ তিনি মহারাজ। আজ সেই বৃন্দাবন ও বৃন্দাবনের বন্ধুদের কথা তাঁর হয়ত মনে নেই। রুক্মিণী,

সত্যভামা প্রভৃতি রাণীদের নিয়ে মহাসুখে তিনি রাজ্যভোগ করে চলেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু সুদামাও সেই কথা ভাবেন। তিনি কেবল বন্ধু নন, মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের একজন অন্ধ ভক্ত। সন্দীপন মুনির পাঠশালায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি একসঙ্গে লেখা-পড়া করেছেন। একসঙ্গে খেলাধূলা করেছেন। ছেলেবেলার সেই মধুর দিনগুলি কি ভুলবার! শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কত ভালোবাসতেন। আজ ভাগ্যদোষে তিনি অতি দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ মাত্র। তাঁর আজ সহায় সম্বল কেউ নেই, কিছু নেই।

সুদামা তাঁর ব্রাহ্মণীকে ছেলেবেলার কথা বলেন। শ্রীকৃষ্ণের গল্প করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। তাঁর কথা বলতে বলতে সুদামার চোখ দিয়ে জল পড়ে। আনন্দে তিনি অধীর হন। ব্রাহ্মণী কিন্তু ব্যঙ্গ করেন। সুদামাকে আঘাত করে কথা বলেন। তিনি বলেন, "তুমিই কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে কাঁদো, কৃষ্ণ তোমাকে মনেও রাখেনি।"

সুদামা বলেন, "ও কথা বলো না, শ্রীকৃষ্ণকে তুমি কতটুকু জানো, তিনি যে দেবতা!"

ব্রাহ্মণী চীৎকার করে বলেন, "দেবতা যদি তাহলে বন্ধুর এই দুঃখ তিনি দূর করেন না কেন? রুক্মিণী, সত্যভামা কত ঐশ্বর্যে কত সুখে আছে, আর তোমার হাতে পড়ে আমার এই দশা! আমার একখানা গয়না নেই, একটা ভালো কাপড় জোটে না!" ব্রাহ্মণী ক্রন্দন করতে থাকেন।

কৃষ্ণনিন্দা শুনে সুদামা কানে আঙুল দিয়ে বলেন, "ছি ছি! শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কি আমার তুলনা! আমার কর্মফল আমি ভোগ করছি, আমার ভাগ্যে ছিল তাই আমি দুঃখ ভোগ করছি।"

ব্রাহ্মণী বলেন, "বুদ্ধি তোমার কবে হবে? নিজের ভাল কে না বোঝে! অতবড় রাজা তোমার বন্ধু, আর তুমি কুঁড়ে ঘরে পড়ে আছ! যাও, শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে আমাদের এই দুঃখের কথা বলো। তিনি আমাদের দুঃখ মোচন করে দেবেন।"

সুদামা লজ্জিত হয়ে বলেন, "ছি ছি! এতকাল পরে সখার কাছে গিয়ে শেষে সামান্য অন্নবস্ত্রের কথা বলব!"

কিন্তু গৃহিণীর তাড়নায় সুদামার মনোভাব টিকল না। শেষ পর্যন্ত সুদূর দ্বারকায় কৃষ্ণ দর্শনে যাওয়াই স্থির হল। কিন্তু এতকাল পরে বন্ধুর নিকট যাচ্ছেন, কিছু উপহার নিয়ে যাওয়া উচিত। অথচ কৃষ্ণকে দেবার মত গরীব ব্রাহ্মণের কিছুই যে নেই। সুদামার চোখ ফেটে জল এল। ব্রাহ্মণী কিন্তু চিন্তিত হলেন না। ব্রাহ্মণের ছেঁড়া চাদরের এককোণে কিছু ক্ষুদভাজা বেঁধে দিয়ে বললেন, "বন্ধুকে দিয়ো। ব'লো তাঁর সখী পাঠিয়েছে।"

পথ অনেক দূরের এবং দুর্গম। পথে নানা প্রকারের ভয়। একা পথ চলা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু কৃষ্ণনাম স্মরণ করতে করতে সুদামা নিরাপদে সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে দ্বারকাপুরীর

সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণীকে যাই বলুন, মনে মনে সুদামার কিন্তু সংশয় ছিল, তাঁর মত গরীব ব্রাহ্মণ শেষ পর্যন্ত রাজপুরীতে প্রবেশ করতে পারবেন কিনা।

কিন্তু এতবড় রাজা হলে কি হবে, শ্রীকৃষ্ণের আদেশ ছিল সাক্ষাৎপ্রার্থী মাত্রেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবে। বিশেষ করে ব্রাহ্মণের জন্য দ্বারকাপুরীর সিংহদ্বার সবসময়ই খোলা থাকত। তাই সুদামা কোন বাধা পেলেন না।
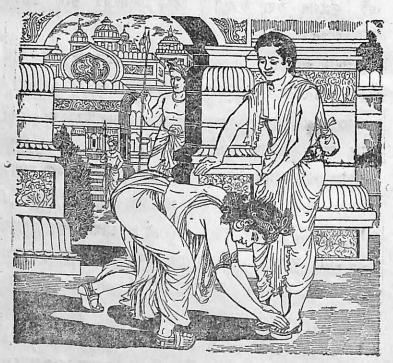
এদিকে শ্রীকৃষ্ণ তখন রাজকার্য শেষ করে অন্তঃপুরে বিশ্রাম করছিলেন। সুদামার আগমন সংবাদ পেয়ে বাল্যবন্ধুকে

অভ্যর্থনা করবার জন্য ছুটে এলেন। সুদামা বন্ধু হলেও ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বড় শ্রদ্ধা। তিনি প্রথমেই সুদামার পদধূলি নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। সুদামাও মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বহুকাল পরে দুই বন্ধুর নিবিড় মিলন হল। শ্রীকৃষ্ণকে দেখে এবং তাঁকে স্পর্শ করে সুদামার দেহ হতে ক্ষুধাতৃষ্ণা ক্লান্তি সমস্তই দূর হয়ে গেল। মন এক স্বর্গীয় আনন্দে ভরপুর হল। ভক্ত তার ভগবানকে লাভ করল।

অন্তঃপুরেও সুদামার যত্ন আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হল না। রুক্মিণী ও সত্যভামা স্বহস্তে তাঁর সেবার ভার নিলেন। এইভাবে উৎসবে আনন্দে গল্পে কথায় কতদিন কেটে গেল। এইবার ঘরে ফিরতে হয়। কিন্তু যে জন্য আসা, লজ্জায় সুদামা তা বলতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণ সুদামার মনের কথা বুঝতে পেরে কৌতুক বশে কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না।

সুদামা বললেন, "এবার তবে বিদায় দাও, সখা।"

শ্রীকৃষ্ণ হাসিমুখে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, "ভুলে থেকো না বন্ধু।"

সহসা সুদামার চাদরের প্রান্তে তাঁর চোখ পড়ল। তিনি রহস্য করে বললেন, "সখা, তুমি বন্ধুকে দেখতে এলে, কই আমার সখী ব্রাহ্মণী তো আমার জন্যে কিছুই পাঠালেন না!"

সুদামা লজ্জিত হয়ে নিজের ছেঁড়া চাদর গোপন করতে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ জোর করে ব্রাহ্মণীর পাঠানো ক্ষুদভাজা কেড়ে নিয়ে মহানন্দে চিবোতে লাগলেন। সুদামা তো অপ্রস্তুত।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "আঃ, কতদিন ক্ষুদভাজা খাই না! আমার সখী আমার প্রিয় খাদ্যই উপহার পাঠিয়েছেন। তাঁকে ব'লো আমি খুব খুশী হয়েছি।"

একমুঠো ক্ষুদভাজা খেয়ে আর একমুঠো যেই মুখে তুলেছেন, রুক্মিণী ছুটে এসে বললেন, "প্রভু, একি করছেন! আপনি আর খাবেন না। ব্রাহ্মণের ঋণ আর বাড়াবেন না। যা খেয়েছেন তার জন্যে এক জন্ম ব্রাহ্মণের ঘরে আমাকে বন্দিনী থাকতে হবে।"

সুদামা লক্ষ্মীরূপিণী রুক্মিণীর এই হেঁয়ালিপূর্ণ কথার কোন অর্থ বুঝতে পারলেন না। বিদায় নিয়ে তিনি গৃহ অভিমুখে চললেন। মনে মনে বললেন, "প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, তুমি যখন আমার সখা, তখন পৃথিবীর সামান্য ধনদৌলতে আমার কি প্রয়োজন। আমি তাই তোমার কাছে কিছু চেয়ে নিলাম না।"

এদিকে দেশে ফিরে সুদামা আর নিজের বাড়ী খুঁজে পান না। যেখানে তাঁর কুঁড়ে ঘরখানি ছিল সেখানে এখন কোনো ধনী ব্যক্তির বিরাট অট্টালিকা উঠেছে। তাঁর গৃহ এবং গৃহিণী কোথায় গেল? দুশ্চিন্তায় সুদামার মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। এমন সময় সেই অট্টালিকা

থেকে দুজন ভৃত্য বের হয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করে বলল, "প্রভু, প্রাসাদে চলুন, মা ঠাকরুন আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন।"

সুদামা নিজের চক্ষু-কর্ণকে যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। ভেতরে গিয়ে দেখেন তাঁরই ব্রাহ্মণী বহুমূল্য বস্ত্র-অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে বসে আছেন। সুদামাকে দেখে তিনি হাসিমুখে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন।

সুদামা বুঝলেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাঁদের এই ঐশ্বর্য হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের সেই বিদায়কালের কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছেন,

"আমায় ভুলে থেকো না, বন্ধু।" সুদামার বড় ভয় হল। দুঃখের সময় এক মুহূর্তের জন্যও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভোলেন নি। এখন সুখের মধ্যে ডুবে গিয়ে যদি ভগবানকে ভুলে যান। বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণীকে নিয়ে তাঁর বিশেষ ভয়।

কয়েকদিন পরে সুদামা ব্রাহ্মণীকে বললেন, "ব্রাহ্মণি, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় রাজ-ঐশ্বর্য পেয়ে সুখী হয়েছো তো? কিন্তু হীরা ফেলে কাঁচে মুগ্ধ হয়ো না, তাহলে বড় ভুল করবে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা পেয়েছো, ঐশ্বর্য তো অতি তুচ্ছ। মনে রেখো, শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র গতি।"

স্বামীর কথা শুনে ব্রাহ্মণীর চৈতন্য হল। তিনি অনুতপ্ত হয়ে বললেন, "আমাকে ক্ষমা করো। আমার আর ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষা নাই, আশা পূরণ হয়েছে। তুমি এখন আমাকে যা বলবে তাই করব।"

সুদামা তখন সমস্ত টাকাকড়ি ধন-ঐশ্বর্য আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র বৃন্দাবনধামে তপস্যা করবার জন্য গমন করলেন।